নুরজাহান :

ইতিহাসের এক বর্ণময় নারী চরিত্র নুরজাহান, ইতিহাসের এক সব-পাওয়া সব হারানো নারী চরিত্র নুরজাহান, ইতিহাসের এক জটিল জালের আধার মোড়া আঁধার রাজ্যের নারী চরিত্র রূপে যদি কাউকে চিহ্নিত করতে বলা হয় তবে সর্বাগ্রে মনে আসে যাঁর নাম সে নাম নুরজাহানের। খাদিজা সাজাহানের গভীর প্রেমে মুমতাজমহল হয়ে তাজমহলের সঙ্গে রয়ে গেছেন জড়িয়ে, কিন্তু মেহেরউন্নিসা 'নুরজাহান' হলেও মোঘল সাম্রাজ্যকে যতটা আলো তার চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার দিয়ে গেছেন।

নুরজাহানের জীবনের দুটি পর্যায় একটি তাঁর কুমারী জীবনের আর শের আফগানের সহধর্মিনী থাকার আর অন্যটি শের আফগানের বিধবা থেকে ভারত সম্রাজ্ঞী হওয়ার এবং তাঁর স্বখাত সলিলে নিমজ্জনের পর্যায়।

আয়াসের কন্যা মেহেরউন্নিসার রূপ ছিল অসাধারণ। সেই রূপ মুগ্ধ করেছিল বাংলার সুবাদার আলিকুলি ইসতাজলকে (শের আফগান)। তাঁর সঙ্গেই বিয়ে হয় মেহেরের। কিন্তু এ সময় আর একজন তাঁকে নৃত্যসভায় প্রথম দেখেই ভালোবেসেছেন, তিনি নারীরূপ-পিয়াসী সেলিম। সম্রাট আকবরের পুত্রের এই রূপ মুগ্ধতা, আসক্তি সে সময় মেহেরের দৃষ্টিও এড়ায় নি। তবে বিয়ে হয়েছে তাঁর শের খাঁর সঙ্গে। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের উপর এর কোন অশুভ ছায়া পড়ে নি প্রথম দিকে। সেখানে তিনি স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে সুখী। যেন বাঙালী ঘরের কুলবধূ। কন্যা লয়লা আর ভ্রাতুষ্পুত্রী খাদিজার গান শুনে তিনি সেখানে আনন্দিত, উল্লসিত। এ পর্যায়ে মেহেরের স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় কোন প্রশ্ন তোলা যায় না, প্রশ্ন তোলা যায় না কন্যার প্রতি তাঁর আত্যন্তিক স্নেহের ব্যাপারেও।

এই স্নিগ্ধ দাম্পত্য জীবনে প্রথম ঘুচে গেল মলয় বাতাসের কাল, মৃদু ঝঞ্ঝায় প্রথম কাঁপন জাগল মেহেরের অবচেতন মনে—কন্যা আর ভাইঝির গান শুনে। আসফ খাঁ যখন জানিয়ে গেলেন দুটি সংবাদ,—

(i) সেলিম এখন জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সম্রাট হয়ে বসেছেন।

(ii) জাহাঙ্গীর শের খাঁকে পাঁচ হাজারীর পদে উন্নীত করে আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

নিজের পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয়ে প্রথম অধীর হয় মেহের। কেননা তিনি জানেন সেলিমের নাম তাঁর মনে আলোড়ন তুলেছে, অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। যা আছে সেটুকু হারাবার ভয়ে তাই মেহের স্বামীকে নিষেধ করেছেন আগ্রায় যেতে কিন্তু স্বামী তাঁর এ উদ্বেগকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি অসহায় বোধ করেছেন। স্বামীর প্রেম তিনি চান অথচ সেলিমকে না-পাবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর নেই—এই দ্বিধা, এই দোলাচলতা যে সুখকে বিপন্ন করে, সে সুখ-শান্তির, স্থিততার—তারই পূর্বাভাস মেলে যেন তাঁর উক্তিতে 'এত সুখ বুঝি কারো সয় না।'

জাহাঙ্গীরকে দ্বিতীয়বার দেখে মেহের আরো অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি স্বামীর বিপদের আভাস পেয়ে তাঁকে নিয়ে আগ্রা ছেড়ে পাণ্ডুয়ায় অথবা বর্ধমানে চলে যেতে চেয়েছেন।

নিজের মনের সঙ্গে যে মেহেরের যুদ্ধ শুরু হয়েছে এ পর্যায়ে তা স্পষ্ট। এমন কি তাঁর আচরণে এমনভাবে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে যে শের খাঁও বুঝে গেছেন তাঁর স্ত্রীর অন্তরে তাঁর প্রতি আর পূর্বের সে একনিষ্ঠ ভালোবাসা নেই। স্ত্রীকে যেন মুক্তি দেবার জন্যই শের খাঁ সম্রাট প্রেরিত ঘাতকের হাতে স্বেচ্ছায় প্রাণ আত্মত্যাগ করেন। এ ঘটনায় জাহাঙ্গীরের উপর নুরজাহান বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। কেননা তাঁকে কাছে পেতে যে নীচতার ও ঘৃণ্য পথের সহায়তা নিয়েছেন তিনি তা মেনে নিতে পারেন নি মেহের। শুধু তাই নয় আত্মবিসর্জনের আগে মেহেরের কাছে প্রেম না পাবার জন্য বীর শের খাঁর হাহাকার সম্ভবত মেহেরকে এমন বিড়ম্বিত করেছে যে স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চেয়েছেন তিনি। ভারত সম্রাজ্ঞী হয়ে সুখবিলাসে মত্ত হবার চেয়ে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করাকেই শ্রেয় ভেবেছেন।

মেহেরের ভাই আসফ খাঁর বারংবার প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত তিনি জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করতে রাজী হন। লায়লার সঙ্গে তাঁর কথা হয় এ বিবাহ প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই— না হলে স্বামী হন্তারককে বিবাহ করার কোন বাসনা ছিল না তাঁর। নুরজাহান নিজেকে জানতেন খুব ভালোভাবেই। তাই ভাই আসফকে তিনি এ সময় জানিয়েছেন তাঁদের এ কাজের পরিণাম ভালো হবে না,—

> "মনে রেখ যে পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রীকে কুপথে ছেড়ে দিচ্ছ। যে ঝঞ্ঝাকে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি বক্ষে চেপে রেখেছিলাম, সে শক্তি তোমরা সরিয়ে দিলে। এখন এই ঝটিকা নির্বিরোধে এই সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে ব'য়ে যাক।"

নুরজাহান জাহাঙ্গীর মহিষী হয়েই হয়ে উঠেছেন ভারত সম্রাজ্ঞী। প্রধান মহিষী রেবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছেন তিনি। সম্রাটের তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখে, শ্রদ্ধা দেখে ক্ষিপ্ত নুরজাহান প্রথমেই চেয়েছেন তাঁর পুত্র খসরুকে হত্যা করতে। পরিকল্পিতভাবে তিনি শুরু করে দিয়েছেন ভ্রাতৃবিরোধ। খসরুকে গোপনে হত্যার পর সে দায় সাজাহানের উপর আরোপ করে তাকেও তাঁর পথ থেকে সরাতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর উদ্দ্যেশ্য জাহাঙ্গীরের সবচেয়ে দুর্বল পুত্র, তাঁর জামাতা শারিয়ারকে সিংহাসনে বসিয়ে নিঃসপত্ন অধিকার ভোগ করবেন।

মোঘল পরিবারের সর্বনাশ সাধন করতে গিয়ে নুরজাহান অবিবেচকের মতো জড়িয়ে পড়েন মোঘল সম্রাটের সুহৃদদের সঙ্গে। সেনাপতি মহাবৎ খাঁ সম্রাটের পরিবর্তে সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা মানতে রাজী না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন তিনি। সাজাহানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ভাই আসফকে শত্রু করে তোলেন। এমন কি কন্যা লয়লাও মায়ের এই নৃশংস আচরণকে সমর্থন করতে পারেন নি। ফলে ক্ষমতালিপ্সু নুরজাহান ক্ষমতার শীর্ষদেশ থেকে গিরিখাদের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর উন্মাদিনী হয়ে যান তিনি সব হারানোর নিদারুণ আঘাতে। কিন্তু সমস্যা এটাই যে এই পরিস্থিতিতেও পাঠক দর্শক চিত্তে তাঁর প্রতি pity ও fear ভাব জাগ্রত হয় না। ফলে ট্র্যাজিক চরিত্র হয়েও নুরজাহান ট্র্যাজেডির সূত্রে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও মমত্ব থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছেন।

রেবা :

জয়পুরের (মেবার) মহারাজা মানসিংহের বোন ঐতিহাসিক চরিত্র মানবাঈ 'নুরজাহান' নাটকের জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী রেবা। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ রাজনৈতিক সম্বন্ধ হলেও তার মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ঘাটতি ছিল না কখনো। আর সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি রেবার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-ভালোবাসা থাকলেও নিজের ধর্মীয় আচার পালন করে গেছেন তিনি আজীবন।

পুত্র খসরুকে নিয়ে তাঁর জগৎ, যদিও তিনি তখন ভারতের সম্রাজ্ঞী। কারো স্বাধীন জীবনধারায় কখনো কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তাঁর ইচ্ছে ছিল না। তিনি জানতেন নারীর প্রতি তাঁর স্বামীর দুর্বলতা। কিন্তু শের খাঁকে হত্যা করে যখন তাঁর স্বামী তাঁর বিধবাকে নিয়ে এসে তোলেন রাজপ্রাসাদে তখন রেবা প্রকৃতই চঞ্চল হয়ে পড়েন। নুরজাহানের সঙ্গে দেখা করে তিনি জানতে চান তাঁর অভিলাষ। নুরজাহান যখন তাঁকে জানান যে এ জীবন তাঁর কাম্য নয়—তখন তাঁকে তাঁর অভীষ্টস্থানে চলে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন।

রেবা সত্যের পূজারী। তিনি তাঁর পুত্র খসরুকে দেখে আপন মনে ভগবানকে জানিয়েছেন "মায়ের এত সুখ ভগবান্, সন্তানের শুভ কামনা করেই মায়ের এত সুখ।" নুরজাহানের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি তাঁকে জানিয়ে দেন সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত তিনি। এমন কি ভারত সম্রাজ্ঞীর পদও। নুরজাহানের মানসিকতার বিপরীত প্রান্তের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। জাহাঙ্গীরও জানতেন রেবার হৃদয়ের এই ঔদার্যের কথা। তাই তিনি তাঁকে নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন নুরজাহানকে বলেছেন চাঁদ।

নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হয়েই রেবাকে চরম আঘাত করেছেন। গোপনে খসরুকে হত্যা করিয়েছেন। অন্যেরা এ সময় নুরজাহানের মুখোমুখি হতে না পারলেও রেবা হয়েছেন। রেবার এই শান্ত ব্যক্তিত্বের কাছে অন্তত ক্ষণিকের জন্য ম্লান হয়ে গেছেন নুরজাহান। কিন্তু পুত্রশোকের চরম আঘাত সহ্য করতে পারেন নি রেবা। তিনি মারা গেছেন। এ সময় নুরজাহান-দুহিতা লয়লা বলেছেন 'পৃথিবী থেকে একটা গরিমা চলে গেলেন—'

'নুরজাহান' নাটকে যে নারী চরিত্রের কাছে ক্ষণিকের জন্যও ম্লান দেখিয়েছে নুরজাহানকে তিনি রেবা। নুরজাহানের হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহ মনোবৃত্তির বিপরীতে রেবার ক্ষমাসুন্দর অবস্থিতি এ নাটকে একটা মাত্রা যোগ করেছে।

লয়লা :

শের খাঁ দুহিতা লয়লা সম্পর্কে শারিয়ার বলেছে,—'লয়লা তুমি একটি প্রহেলিকা'। সে প্রকৃতই দর্শক পাঠকের কাছে প্রহেলিকা, তাঁদের মনে নিশ্চিত প্রশ্ন জাগে এমনও কি হয়?

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা লয়লা তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী। সত্যের পথে চলায় আগ্রহী। যা শুনে তাই আপনি শিখে মানসিকতায় শৈশবে শিখেছে কিছু বিষাদ সঙ্গীত। যার কিছু কথা এরকম,—

"তবু যদি হাসে ধরা সুখের সে হাসি হায়—
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্ব'লে যায়—জ্ব'লে যায়।"

এই জ্বলন যখন ছিল না তার তখন গেয়েছে সে এ গান। কিন্তু প্রকৃতই এই জ্বালা শুরু হয়েছে তার পিতার নিধনের পর। জাহাঙ্গীর তার মাকে কামনা করেন, সে কামনা চরিতার্থ করার জন্য শের খাঁকে হত্যা করে তাকে এবং তার মাকে নিয়ে যান রাজপ্রাসাদে। ফলে বুদ্ধিমতী লয়লা বুঝে গেছে সব কিছু। মায়ের মানসিকতাও ধরা পড়ে গেছে তাঁর কাছে। মাকে নানা ভাবে আঘাত করে সত্য ও ধর্মের দোহাই দিয়ে জাহাঙ্গীরের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে কিছু দিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নুরজাহান লোভের ফাঁদে পড়ে বিয়ে করেছেন জাহাঙ্গীরকে।

জাহাঙ্গীরকে আঘাত করতেও দ্বিধা করে নি লয়লা—যদিও জাহাঙ্গীর কেবল নুরজাহানের জন্যেই ক্ষমা করেছেন তাকে। আর এর পরেই লয়লা মায়ের ভাবনার সঙ্গে যোগ দেয়। উদ্দেশ্য কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ফলে মামা আসফের মতো সেও মাকে ভারত সম্রাজ্ঞী হয়ে নিজ লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হতে বলে। শুরু হয় সম্রাট পরিবারে ধ্বংস যজ্ঞ। তার আচরণ দেখে সাজাহান রসিকতা করে খাদিজাকে বলেছেন 'নুরজাহানের মেয়ে যেন দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ।'

লয়লা চরিত্র গড়া কোমলে-কঠোরে। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ বাসনা তার মনেও জেগেছিল সত্য কিন্তু নুরজাহানের মতো তা কখনো নিরবচ্ছিন্ন সত্য ও সুন্দরের থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে নয়। তাই দেখা যায় সে রেবার মধ্যকার সত্য ও সুন্দরকে অনুভব করতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে মায়ের অন্তরে যে বীভৎসতা বাসা বেঁধেছে তার বিস্তার সীমাহীন। মাকে তার সেই ধ্বংসের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্যও প্রয়াসী হয়েছে কিন্তু পারে নি।

মায়ের চক্রান্তে রেবার একমাত্র পুত্র খসরুর মৃত্যু এবং সে মৃত্যুর দায় সাজাহানের উপর চাপিয়ে তাকে ও পথের কাঁটার মতো দূরে সরিয়ে দিতে চাইলে ব্যথিত হয়ে ওঠে লয়লা। মায়ের পৈশাচিকতাকে সে আর সমর্থন করতে পারেনি। নুরজাহান চেয়েছিলেন জাহাঙ্গীরের সবচেয়ে দুর্বলতা পুত্র শারিয়ারের সঙ্গে লয়লার বিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে অটুট রাখতে। মায়ের সে পরিকল্পনায় কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সারল্য ও সুন্দরের কাছে হার মেনেছে লয়লা। কেননা শারিয়ারকে সে শুধু বিয়ে করে নি ভালোও বেসেছে।

লয়লা ক্ষমতা চায়নি। সে চেয়েছে তার স্বামীকে নিয়ে সুখের নীড় বাঁধতে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার সেই কালপর্বে তার স্বামীর চোখ অন্ধ করে দেয় মায়ের প্রেরিত বন্দররাজ। তাতেও লয়লা ভেঙে পড়ে নি সে অন্ধ স্বামীর সেবা করেছে। আর এ সময় সব হারানোর বেদনায় আর একবার স্বামী হারিয়ে নুরজাহান যখন উন্মাদিনী তখন সে তাঁকেও তার সেবার জগতে আশ্রয় দিয়েছে। এ নাটকে ঔদার্যের প্রতিমূর্তি যেন সে। কিন্তু বিস্ময় এখানেই—কারণ তার ঘন ঘন মন পরিবর্তনের ব্যাপারটি বড় আকস্মিক ঠেকেছে অনেকবার।

জাহাঙ্গীর :

সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম সিংহাসনে আরোহনের সময় উপাধি নিয়েছেন 'জাহাঙ্গীর'। দ্বিজেন্দ্রলাল 'নুরজাহান' নাটকে এই চরিত্রের দুটি পর্যায়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—সেলিম চরিত্রের যে অংশটি তা কেবল স্মৃতি চারণা অথবা অন্যের মুখে বর্ণনায় পরিস্ফুট আর দ্বিতীয় পর্যায় জাহাঙ্গীরের। এ পর্যায়ে তাঁর সম্রাট সত্তা যতটা না প্রবল তার চেয়ে অনেক বেশি বড় হয়ে উঠেছে তাঁর নুরজাহানের দ্বারা সম্মোহিত সত্তা এবং সুরায় নিমজ্জিত সত্তা।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ইতিহাসসিদ্ধ চরিত্র। ইতিহাসে দেখা যায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি এক সময়ে কিন্তু পরে পিতার মতোই পরধর্ম সহিষ্ণু, সবার প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন শাসক হয়ে ওঠেন। অম্বরের হিন্দু রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাঈ ছিলেন তাঁর সম্রাজ্ঞী—এ নাটকে তাঁর নাম রেবা। রেবার প্রতি জাহাঙ্গীরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার—যদিও এ বিবাহ পিতার ইচ্ছানুসারে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিবাহ।

'নুরজাহান' নাটকে জাহাঙ্গীর নন, প্রধান বিবেচ্য চরিত্র নুরজাহান। তাই জাহাঙ্গীর-নুরজাহান সম্পর্কের ভিত্তিতেই এই নাটকে এই চরিত্রটি পরিকল্পিত ও পরিবেশিত। সেখানে ইতিহাস তার উপাদান নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে এ কথা যেমন সত্য—নাট্য প্রয়োজনে কল্পনার উপস্থিতিও তেমনি সত্য।

নাট্য সূচনাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেলিম সম্রাট পদে আসীন হয়েছেন। আসফ খাঁ শের খাঁকে জানিয়েছেন '...আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে সম্রাট হয়েছেন' সেলিম। আর একই সঙ্গে বার্তা এসেছে তাঁর কাছে আসফেরই মারফৎ যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে পাঁচ হাজারীর পদ দিয়ে আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের এই পদক্ষেপ তাঁর নুরজাহানের প্রতি নিদারুণ আসক্তির বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। নুরজাহানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। যেখানে দেখা মাত্রই তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্যত্র বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে পাওয়া তাঁর হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু সম্রাট হওয়ার পর তিনি মেহেরকে পাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। শের খাঁর পদোন্নতি ঘটিয়ে তাকে নিজের কাছে আনা তাঁর প্রথম প্রয়াস। এর পর তিনি একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছেন মেহেরকে পাবার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য শের খাঁকে হত্যা করার। গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর হত্যার চেষ্টা, ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গে যুদ্ধের নামে তাঁকে হত্যার চেষ্টা—সব ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। শেষে শের খাঁ তাঁর প্রেরিত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। আর তাঁর বিধবাকে তিনি রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিয়ে এসেছেন আগ্রায়—নিজের প্রাসাদে।

জাহাঙ্গীরের কামুক প্রবৃত্তির পরিচয় মেলে নুরজাহানকে ছলে-বলে-কৌশলে আয়ত্তে আনার নানা প্রয়াসের মধ্যে। নুরজাহানের পিতা আয়াসকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন তিনি। প্রধানা বেগম রেবাকেও মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য রেবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে তখনও ছিল তার প্রমাণ মেলে নুরজাহানকে তিনি এক সময়

বলেছেন যে রেবা তাঁর প্রতি কখনো ঈর্ষাতুরা হতে পারেন না। কারণ তাঁর মতে,—

> "অসূয়া হয় কতক সমানে সমানে। কিন্তু রেবা আর তুমি ভিন্ন জগতের। রেবা ঊর্দ্ধস্থিত নক্ষত্রের মত স্থির, ভাস্বর, নিষ্কলঙ্ক! আর তুমি তার বহু নিম্নে পূর্ণচন্দ্রের মত এত সুন্দর, কারণ এত কাছে।"

রেবা যে তাঁর মহিষী হয়েও সব সময় তাঁর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে নেই একথা জাহাঙ্গীর জানেন। আর নুরজাহানের নিজস্ব সে তেজ নেই, আলো নেই—অন্যের আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁর অন্যকে মুগ্ধ করা, সম্মোহিত করা, বশীভূত করা।

সৌন্দর্যের কাছে, নুরজাহানের প্রবল আকর্ষণের কাছে আর সুরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন জাহাঙ্গীর। তাঁর এই অসহায় আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা স্পষ্ট অনুভূত হয়েছিল কেবল তাঁর একান্ত অনুগত সেনাপতি মহাবৎ খাঁর কাছে। অন্যেরা তাঁকে বুঝতে পারেন নি ঐ দুর্বলতাকেই। সভাসদেরা জাহাঙ্গীরের আচরণের নিন্দা করেছেন গোপনে। নুরজাহান সব ক্ষমতা হস্তগত করে জাহাঙ্গীরের পুত্রদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করতে শুরু করলে তাঁরা সম্রাটের অপদার্থতাকে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু জাহাঙ্গীর কিছু করতে পারেন নি। তবু এই পরিস্থিতিতেও তিনি নুরজাহানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্তত একবার ভিন্ন মত জানিয়েছেন মহাবতের জন্য। খসরু হত্যার দায়ে সাজাহানকে শাস্তি দেন নি।

রূপের কাছে আত্মসমর্পণ এবং সর্ব সমর্পণ জাহাঙ্গীরকে যে ধীরে ধীরে সর্বনাশের দিকে আকর্ষণ করছে তা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু সব বুঝেও কিচ্ছু করতে পারেন নি সম্রাট। নুরজাহান কৌশলে খসরুকে খুন করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন জানতে পেরেও তিনি নীরব দর্শক হয়ে থেকেছেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবরাজ সেলিম সম্রাট জাহাঙ্গীর হয়ে নুরজাহানকে বিবাহ করার পর ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল মানবে পরিণত হয়েছেন।

'নুরজাহান' নাটকে জাহাঙ্গীর চরিত্রটি নুরজাহানের মতো অন্তর-বাইরে সক্রিয় নয়—নাটকে সক্রিয়তা কাম্যও ছিল না। যে জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে লাভের পূর্বে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পৃথিবীর সম্রাট হবার বাসনা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন—যিনি শের খাঁর তাঁহার মত প্রবল শক্তিশালী পুরুষকে হত্যার নিপুণ আয়োজন করে মেহেরকে কাছে টেনে নিয়েছেন। যাঁর আকর্ষণের পদ্ধতি দেখে রেবা পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন। পাছে সর্বনাশের কালো ছায়া পরিব্যাপ্ত হয় এ পরিবারের উপর তাই সেই অশুভ দূর করার জন্য নিজে এগিয়ে এসেছিলেন—সেই জাহাঙ্গীর এ নাটকে এতখানি নিষ্ক্রিয় থেকেছেন কারণ তিনি নুরজাহানের জন্যে হয়ে উঠেছিলেন উন্মত্ত।

নাটকের প্রথম দিকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীরের পদক্ষেপ তাঁকে সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর মানবে পরিণত করেছিলো কিন্তু নাটকের শেষ দিকে যখন প্রবৃত্তির দুর্বার আক্রমণে জাহাঙ্গীর অন্যের হাতের ক্রীড়নক—তখন তিনি যেন এক ভাগ্য বিড়ম্বিত পুরুষ। যে আগুনে অন্তরের সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষার শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে হৃদয় সেঁকতে চেয়েছিলেন, সে আগুনের স্পর্শমাত্রই তাঁর হৃদয় গেল দগ্ধ হয়ে! যখন তিনি সব কিছু বুঝেছেন তখনও তাই তিনি অসহায়। সৌন্দর্যের কাছে আত্মবিক্রিত জাহাঙ্গীর সেখানে অনুগত সেনাপতি মহাবৎ খাঁর কাছে নতজানু হয়ে নুরজাহানের জীবন ভিক্ষা করেছেন। তাই জাহাঙ্গীর নুরজাহানের

প্রতি কেবল কামুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, লাম্পট্যই তাঁর চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য—এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের ধারণায় কোথাও যেন ভুল থেকে গেছে। রূপের কাছে নতজানু জাহাঙ্গীর শেষে প্রেমের কাছেও নতজানু। কেননা তাঁর চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য এ নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে—দুটিই সুরা কেন্দ্রিক। একটি সাকীর হাতের সুরা আর অন্যটি প্রেমের। এই দুই আকর্ষণই বিড়ম্বনায় ফেলে শেষে এই চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক করে তুলেছে।

শের খাঁ :

বাংলার সুবাদার আলিকুলি ইসতাজল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন শের আফগান নামে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' নাটকে নুরজাহানের মনে জাহাঙ্গীর বরণে সবচেয়ে বড় বাধা এই শের খাঁর চরিত্রটি। 'নুরজাহান' নাটকে শের খাঁ চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক মহৎ প্রাণ ব্যক্তি রূপে আঁকা হয়েছে। বর্ধমানের শাসনকর্তা শের খাঁ ছিলেন অসম্ভব শক্তিশালী যোদ্ধা। আত্মশক্তিতে ছিল তাঁর প্রবল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই তিনি খালি হাতে (?) বাঘ মেরে তাঁর সাহস ও শক্তিকে প্রায় প্রবাদে পরিণত করেছিলেন। এই নাটকে তাঁর চরিত্রের দুটি রূপ পরিস্ফুট,—

(i) তাঁর অসাধারণ সাহস, শক্তি ও আত্মবিশ্বাস।

(ii) পত্নীর প্রতি অপরিসীম প্রেম।

শের খাঁ ছিলেন মুঘল সম্রাটের অনুগত ছোট সেনাপতি। সম্রাটের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি হেলন করার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাই সেদিক থেকে যে কোন সমস্যা আসতে পারে সে কথা তিনি কখনো ভাবতে পারেন নি। কিন্তু সেদিক থেকে যখন আঘাত এলো তখন অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করেছেন তিনি। তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর গৃহের ঐশ্বর্যে, 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী'।

পত্নী মেহেরের প্রতি ছিল শের খাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। তাঁর বিশ্বাস ছিল এ ভালোবাসা পরস্পর-নির্ভর এক অটুট বন্ধন। সেই ভালোবাসার উপর ভরসা রেখেই শের খাঁর দুঃসাহসী পদক্ষেপ। তাঁর বেঁচে থাকার আগ্রহের মূলে এবং শক্তির মূলেও ছিল এই অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী মেহেরউন্নিসার ভালোবাসার ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধতা। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে পাঁচ হাজারীর পদ দিয়ে আগ্রায় আমন্ত্রণ জানালে তাই তিনি মেহেরের দুশ্চিন্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কারণ তখন পর্যন্ত তিনি সম্রাটের প্রতি এবং পত্নীর ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাসে ছিলেন অবিচল। এই দুই তরফের কোন এক দিক থেকেও যে আঘাত আসতে পারে এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি তিনি।

মেহেরউন্নিসার বাবা সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ আয়াস খাঁর কাছে প্রথম তিনি জানতে পারেন সম্রাটের গোপন অভিসন্ধির কথা। ইতোপূর্ব্বে দু'দুবার তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। এক বার গুপ্ত ঘাতকদের দ্বারা, অন্যবার খেলাচ্ছলে তাঁকে হত্যার প্রয়াসের দ্বারা, এই দুটি ক্ষেত্রে সম্রাটের যে কোন হাত থাকতে পারে সে কথা এত দিন বিশ্বাস করতে চান নি তিনি। কিন্তু সুবাদার কুতবের দ্বারা গোপনে আক্রান্ত হবার পর তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর বারবার প্রাণনাশের চেষ্টার পশ্চাতে রয়েছে সম্রাটের গোপন ইচ্ছা।

শের খাঁ ভাবতে পারেন নি তাঁর স্ত্রীর অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসায় টান প্রভাবে

কখনো। সম্রাটের অভিসন্ধি জানার পর তাঁর মনে হয়েছে পুরাণো কথা। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে গৃহে ফিরে আসনে যখন তিনি ঠিক তার কিছু পূর্বেই জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা সম্রাটের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। সে সময় মেহেরউন্নিসাকে খুব চঞ্চল দেখিয়েছিল। কিন্তু কেন সে চঞ্চলতা তা অবশ্য বোঝেন নি তিনি। এবার স্পষ্ট উপলব্ধি হলো তাঁর। প্রেম হারানোর গভীর চিন্তা গ্রাস করেছে তাঁকে,—

> "আগ্রা থেকে এই পাণ্ডুয়ায় আসা থেকে মেহের আরও অধীর হয়েছে; কথায় কথায় বিচলিত হয়, আবার পরে অনুনয় করে।"

অষ্টম দৃশ্যে শের খাঁর অন্তর্বেদনার যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে—সে জানিয়েছে,—

(i) "মানবচরিত্র আমি ঠিক বুঝি না, হতে পারে; কিন্তু আমি প্রেমিক, প্রেম পিপাসু।"

(ii) "আমি তোমার কাছে গিয়েছি শুষ্কতালু ফিরেছি শুষ্কতালু। —মেহের!"

প্রেমের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতায় হাহাকার করে উঠেছেন শের খাঁ। যৌবনে তিনি যে চরম ভুল করে মেহেরকে বিবাহ করেছিলেন একথা উচ্চারণ করতে তার বুক ভেঙে খান খান হয়ে গেছে,—

> "সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুরা পান করেছিলাম! জান্তাম না যে বিষপান কর্ল্লাম!"

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসও টলে গেছে। তিনি ভেবেছেন 'যদি এ সময়ে একবার সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পেতাম।' হত্যার লীলায় আর নিজেকে জড়াতে চান না শের খাঁ। তিনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে অস্ত্রত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা—এ অমীমাংসিত বিতর্ক শেষ পর্যন্ত অটুট রয়েই গেল।